যুগান্তর

তারিখ 24 MAY 2016
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

শিক্ষার মানের কথা উঠলেই হতাশা জেগে ওঠে

শতফুল ফুটতে দাও

ড. মাহবুব উল্লাহ্

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। তদসত্ত্বেও একথা সত্য, এখন জনগোষ্ঠীর পঞ্চাশ শতাংশেরও অধিক মানুষ কিছু না কিছু লেখাপড়া জানে। এর একটি বড় কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রায় ১০০ শতাংশ স্কুলে যায়। স্কুলে ভর্তির হার বাড়াতে সরকার নানা রকম প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১৯৯১ সাল থেকে নির্বাচিত সরকারগুলো স্কুলে ভর্তির হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ব্যাপক হারে উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি। সরকারের এসব প্রণোদনার মধ্যে অনেক দুর্নীতি হয়। তদসত্ত্বেও প্রণোদনাগুলো যে কার্যকর হয়েছে তার প্রমাণ বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে বাংলা শের সাফল্য ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি। তবে শিক্ষার সংখ্যাগত বিস্তার ঘটা সত্ত্বেও শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এ মুহূর্তে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগতমান অর্জনই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। শিক্ষার গুণগত মানে অবনতির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে যোগ্য শিক্ষকের অভাব, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, বিশেষ করে স্কুল ভবনগুলোর জরাজীর্ণ দশা, গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরির অভাব, টয়লেটের অভাব এবং টয়লেট থাকলেও সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়া। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগ এবং স্কুল ব্যবস্থাপনায় ভয়াবহ রকমের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ শিক্ষার পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে। গত কয়েক বছরে জাতীয় বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ মোট বরাদ্দের শতাংশ হিসেবে হ্রাস পেয়ে চলছে। 'টিচিং এইড' হিসেবে কম্পিউটারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও অধিকাংশ স্কুলে কম্পিউটার জানা শিক্ষক না থাকায় কম্পিউটারগুলো পাঠদানের কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এর ফলে কম্পিউটার কেনায় ব্যবহৃত অর্থ থেকে কোনো ফলই পাওয়া যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে ২২ মে যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ের শিক্ষক নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে আইসিটি বাধ্যতামূলক করা হলেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়নি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এমপিও দেয়া হচ্ছে না। ফলে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় এ কোর্সে পাঠদান চলছে জোড়াতালি দিয়ে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী।'

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের শিখরে স্থাপনের দাবি সরকার করলেও দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার টেকসই করার জন্য যেখান থেকে কাজ শুরু করা উচিত, সেখানেই থেকে যাচ্ছে বড় ধরনের ঘাটতি। বস্তুত শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি সমন্বিত না করা গেলে এই প্রযুক্তির ব্যবহার কোনোক্রমেই টেকসই হবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি বড় সমস্যা হল সম্পূরক উপকরণের অভাব। এ সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ দিতে গিয়ে উন্নয়ন অর্থনীতির একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'কৃষির যন্ত্রায়নের জন্য একটি বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা একটি দেশকে কয়েকশ' ট্রাক্টর সাহায্য হিসেবে দিয়েছিল। কিন্তু ট্রাক্টরগুলো কাজে লাগানো যায়নি, কারণ সে দেশের কৃষক ট্রাক্টর চালাতে জানত না। দেখা গেল ট্রাক্টরগুলো খোলা আকাশের নিচে মরিচা ধরে ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়েছে এবং পরিশেষে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এভাবে দাতা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া ট্রাক্টরগুলো একদিনের জন্যও ব্যবহৃত না হয়ে মাটিতে মিশে গেছে। বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণায়ক যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো চালানোর জন্য টেকনিশিয়ান না থাকার ফলে এবং প্রয়োজনে মেরামতের ব্যবস্থা না থাকায় বাক্সবন্দি অবস্থায় পড়ে থাকছে। এক সময় এগুলো ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সমস্যাটির প্রতি নজর না দেয়ার ফলে চিকিৎসার গুণগত মান ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদেশ থেকে উপকরণ আমদানিতে যত উৎসাহ দেখা যায় তার সিকিভাগও দেখা যায় না উপকরণগুলো ব্যবহারের নিশ্চয়তা সৃষ্টিতে। উপকরণ আমদানি করলে কমিশন ভোগীদের পকেট ভারি হয়। কিন্তু এগুলো ব্যবহারের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করলে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ খুবই সামান্য। তাই যন্ত্রপাতি আমদানি হয়; কিন্তু কাজে লাগানো হয় না। সরকারি বাজেট বরাদ্দে অপরিণামদর্শিতা দেশের অনেক ক্ষতি করছে। জনগণের দেয়া ট্যাক্সের অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না এবং এ থেকে শুধু একশ্রেণীর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারীরা লাভবান হয়। এ রকম শত সহস্র পৃষ্ঠপোষকতা কর্মের মধ্য দিয়েই এদেশে গড়ে উঠেছে একটি লুম্পেন ধনিক শ্রেণী। আর বাড়ছে আয় বৈষম্য। একেই বলা হচ্ছে উন্নয়ন।

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে গুণগত মানের সমস্যা। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মানের ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে অবনতি হচ্ছে। যে ছাত্রটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা পায় না, তার পক্ষে পরবর্তী ধাপগুলোতেও মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয় না। যে ছাত্র পূর্ববর্তী ধাপে যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেনি, সে কীভাবে

পরবর্তী ধাপের শিক্ষা আত্মস্থ করবে? আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব বইপত্র, জার্নাল, আর্টিক্যাল পড়ার জন্য ছাত্রদের নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলো পাঠ করা এবং বোঝা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ এগুলো ইংরেজি ভাষায় রচিত। ইংরেজি ভাষায় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা সাধারণভাবে খুবই নিম্নমানের। শব্দ ভাণ্ডারের দিক থেকে দুর্বল হওয়া এবং ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ করে লিখতে না পারার ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের রেফারেন্স গ্রন্থগুলো হজম করা সম্ভব হয় না। কার্যত ছাত্রছাত্রীরা রেফারেন্স বই পড়ার কঠিন কাজটি করতেও চায় না। তারা তাদের পূর্বসূরিদের লেখা নোটগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত। এ নোটগুলো বারবার ফটোকপি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে পাঠযোগ্য থাকে না। এর ফলে একদিকে যেমন জ্ঞানের নবায়ন হচ্ছে না, অন্যদিকে তেমনি ভুলভাবে শেখারও সুযোগ থেকে যাচ্ছে। শিক্ষার মানে যে ধস নেমেছে তা যে কত ভয়াবহ তার একটি দৃষ্টান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক শিক্ষক হিসেবে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে দিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারা মাস্টার্স পর্যায়ে কী কী কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। তাদের অধিকাংশের জবাবই আমাকে দারুণভাবে হতাশ করেছে। মাত্র দুই কী এক বছর আগে পাস করা ছাত্র কিংবা ছাত্রীটি তার একটি কিংবা দুটি কোর্সেরও নাম বলতে পারেনি, এগুলোর বিষয়বস্তু তো দূরের কথা। এই যদি হয় শিক্ষার মানের অবস্থা তাহলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ কী! বুঝলাম সবাই মহাজ্ঞানী হবে না, তবে কিছু জ্ঞান তো তাদের থাকতে হবে। গুণগত মানের দিক থেকে ভয়াবহ রকমের দুর্বল এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যারা খুব ভালো ফল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছে, তাদের ব্যাপারেও অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। এ রকম দুর্বল শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে কী মানের শিক্ষা দেবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা মনে হয় অসঙ্গত নয়। এদের অনেকে নিজের জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে সংকীর্ণ 'রঙের' রাজনীতি আছে তাতে জড়িত হয়ে পদোন্নতির পদ খোলাসা করতে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত করতে ব্যস্ত থাকেন। এমন চরিত্রের শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্ররাই বা কী পাবে? মোদ্দা কথায় বলা যায়, সার্বিকভাবে শিক্ষার মানে যে ধস নেমেছে তার ফলে আগামী ২০ কী ৪০ বছরে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। তখন লেখাপড়া বলে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে কিনা সন্দেহ। রাজনৈতিক অঙ্গনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে। বর্তমানে ছয় থেকে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও ভবিষ্যতে এর ধারাবাহিকতা থাকবে কিনা তা মূলত নির্ভর করছে আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করতে পারছি কিনা, তার ওপর। কার্যত আমরা একটি অজ্ঞানতার সমাজের দিকে দ্রুত ধাবমান। বিশ্বজুড়ে জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং জ্ঞানের সীমার দিক থেকে উল্টোপথে হাঁটতেই যেন আমরা তৃপ্তি পাই। এটি ভয়ানক আত্মঘাতী চর্চা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মানে অবনতির আরেকটি বড় কারণ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর বেহাল দশা।

দৈনিক বণিকবার্তা ২১ মে 'উচ্চশিক্ষায় সবচেয়ে অবহেলিত গ্রন্থাগার' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হল একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। অথচ দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গ্রন্থাগার উন্নয়নে থাকে না পর্যাপ্ত বরাদ্দ। এতে চাহিদা মতো নতুন বই সংযোজন করতে পারে না গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। এছাড়া যে হারে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বাড়ছে, সে অনুযায়ী গড়ে উঠছে না গ্রন্থাগার অবকাঠামো। সব মিলিয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় খুবই অবহেলিত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গ্রন্থাগার।' এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গ্রন্থাগার খাতে অবহেলার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটের চিত্রে নজর দিলে। অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে খুবই কম বরাদ্দ দেয়া হয়। রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আর কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন দুই শতাধিক। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টির মোট ব্যয় প্রায় ৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে গ্রন্থাগারে নতুন বই কেনা বাবদ বরাদ্দ ছিল মাত্র ১ লাখ টাকা। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ময়মনসিংহের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। অথচ ওই শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের জন্য কোনো নতুন বই সংগ্রহ করেনি প্রতিষ্ঠানটি। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গ্রন্থাগার খাতে বরাদ্দের হার তুলনামূলক বেশি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্রন্থাগারে মোট শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যার ২৫ শতাংশ হারে গ্রন্থাগারে আসন থাকা বাঞ্ছনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আসন রয়েছে মাত্র ১ হাজার ১০০টি। এর মধ্যে বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে আসন রয়েছে ৪০০টি। সে হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৪ শতাংশ শিক্ষার্থীর জন্য গ্রন্থাগার সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নে গ্রন্থাগার খাতে প্রতি বছরই ব্যয় বাড়ানোর কথা। উল্টো ঘটনা ঘটছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৩ সালে ৬৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার খাতে মোট ব্যয় ছিল প্রায় ২১ কোটি ৮৯ লাখ ৭১ হাজার টাকা। গড় হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় ছিল ৩৪ লাখ ২১ হাজার টাকা। ২০১৪ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ কোটি ৩ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় কমেছে ৩৫ শতাংশ।

মোট কথা হল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার খুবই অবহেলিত। গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ না করতে পারলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কীভাবে সমৃদ্ধি আসবে! তবে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হলেই এর ব্যবহার বাড়বে একথাও স্বতঃসিদ্ধ নয়। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে যতটুকু জানি তা হল, প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক সিদ্দিক খান সাহেব অবসর গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কোনো সার্বক্ষণিক গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দেয়া হয়নি। গত ৪০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে গ্রন্থাগার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে দেশের প্রাচীনতম সর্ববৃহৎ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যে কিছুটা হলেও অবহেলিত সে কথা কি অস্বীকার করা যাবে? এ গ্রন্থাগারের বইয়ের স্টেকে প্রবেশ করে দেখেছি সংগৃহীত বইগুলোর ওপর পুরো ধুলোর আস্তরণ জমা হয়েছে। এগুলো হাতে নিলে হাত নোংরা হয়ে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য দু-চারটি ব্লোয়ার কিংবা সাকার মেশিন কি ব্যবহার করা যায় না? এতে কত টাকাই বা খরচ হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই গ্রন্থাগারে আধুনিক বইপত্র পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু অতীতে সংগ্রহকৃত ক্লাসিক গ্রন্থাবলীর ইস্যু স্লিপ পরীক্ষা করলে দেখা যায়, ওইসব গ্রন্থ কোনো পাঠকই কখনও পড়ার জন্য ইস্যু করায়নি। এই দুঃখই বা ঘোচাব কী করে! জ্ঞান আহরণের জন্য আধুনিক বইপত্রের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলে ক্লাসিক গ্রন্থগুলোয় একটু চোখ বোলানো হবে না, তাও মেনে নেয়া কঠিন।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্লাসিক গ্রন্থগুলো নতুন জ্ঞান সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ কাজ করতে পারে। মনে হচ্ছে আমাদের এই জ্ঞানবিমুখ সমাজে এগুলোর কানা কড়ির মূল্য নেই। সব মিলিয়ে শিক্ষার মানে যে অবনতি ঘটছে তার জন্য একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় নীতি এবং চলমান রাজনীতি দায়ী, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানবিমুখতার সংস্কৃতিও কম দায়ী নয়। এছাড়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে ছোট ছোট আলোচনা ও চিন্তার অনুশীলনও খুব জরুরি। শিক্ষকরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে লেকচার কর্মসম্পাদনের পর নিজ রুমে তালা মেরে বাসস্থান কিংবা অন্য কোথাও চলে যান, তাহলে জ্ঞান অনুশীলনের কাজটি কী করে সম্পাদিত হতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডের ওপর যদি একটি টাইম বাজেট সার্ভে করা হতো তাহলেও বোঝা যেত উচ্চশিক্ষায় দুর্বলতার উৎস কোথায়? এ রকম একটি টাইম বাজেট সার্ভে জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে এরকম সার্ভে থেকেও কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে তা নিয়েও সন্দেহ আছে। কারণ যাদের ওপর সার্ভে করা হবে, তারাও সময়ের সদ্ব্যবহার করেন বলে জানান দিতে জ্ঞান আহরণে লিপ্ত সময় বাড়িয়ে বলতে পারেন। আসলে জাতি হিসেবে আমরা এক দুঃসময় পার করছি। যে সমাজে নগদ প্রাপ্তির কাছে জ্ঞান অর্জনের মূল্য অতি নগণ্য, সেই সমাজে এই মুহূর্তে ভালো কিছু আশা করা যায় না। হতাশার সুরে লেখাটি সমাপ্ত করতে হল বলে দুঃখবোধ করছি।

ড. মাহবুব উল্লাহ : *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক*